ল স্ট ই ন আ মে রি কা

আমি কেমন করে আমেরিকায়
হারিয়ে গিয়েছিলাম

আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিগদ্য

লস্ট ইন আমেরিকা

আমি কেমন করে আমেরিকায় হারিয়ে গিয়েছিলাম

আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার

ভাষান্তর ও ভূমিকা
দিলওয়ার হাসান

বেঙ্গলবুকস

অনুবাদকের উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ও শাশুড়ি : মরহুম
এরশাদ হোসেন বিল্লাহ ও মরহুমা আতিয়া বিল্লাহ; তাঁদের কন্যা
ইরা তসলিম, শাহনাজ বিল্লাহ ডোরা, নাহিদ বিল্লাহ ইপু, শারমিন
বিল্লাহ পুনম; পুত্র মুহাম্মদ হোসেন বিল্লাহ রানা; পুত্রবধূ মাহবুবা
বিল্লাহ রিঠু; আর জামাতা এবিএম তমলিম উদ্দিন জানু, ইকবাল
হোসেন ও মঞ্জুর হোসেন পলাশ।

প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছি যাদের।
যারা শ্রদ্ধায়, স্নেহ-ভালোবাসায় নক্ষত্রের ফুল ফোটায়
দারুণ দহন দিনে...

•

নোবেল পুরস্কার গ্রহণের
প্রাক্কালে এক বিশেষ মুহূর্তে
আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার

লেখকের কথা

এই বইটি ও এর আগে লেখা দুটি বই *আ লিট্‌ল বয় ইন সার্চ অব গড* ও *আ ইয়ংম্যান ইন সার্চ অব লাভ*কে আমি পরিপূর্ণভাবে আত্মজৈবনিক বলে দাবি করিনি; কারণ ওই বইয়ে যাঁদের কথা লিখেছি তাঁদের অনেকেই তখনো জীবিত ছিলেন। এ ছাড়াও অন্যকিছু কারণে সাধারণ স্মৃতিকথার রীতিতে বইটি লেখা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। আসলে আমি বিশ্বাসই করি না—কোনো মানুষের জীবনের গল্প লেখা যেতে পারে। বিষয়টা সাহিত্যের ক্ষমতার বাইরে। যেসব ঘটনা আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি তা আমাকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে। যাঁরা আমার ঘনিষ্ঠজন ছিলেন তাঁদের মনে কোনোরকম আঘাত যাতে দিতে না হয় সেজন্য আমি সত্য বিকৃত করেছি, ঘটনার তারিখ ও স্থান বদলে দিয়েছি। সত্যের পটভূমিকায় লেখা কাহিনি ছাড়া এগুলোকে অন্যকিছু বলে গণ্য করিনি। পুরো লেখাটাকে আমি আত্মজীবনী রচনায় কিছু তথ্য সংযোজন বলে অভিহিত করতে চাই, যে আত্মজীবনী আমি লিখতে চাইনি।

বইটি ইডিশ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জোসেফ সিঙ্গার। এই বইয়ের অঙ্কনশিল্পী হিসেবে খ্যাতনামা শিল্পী ও আমার বন্ধু রাফায়েল সোয়েরকে পেয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত। তাঁদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই বইয়ের নিষ্ঠাবান সম্পাদক ইভ রাশেভস্কিকে।

আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার

সম্মোহনী কথা কাহিনির জাদুকর

এক

আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার খ্যাতিমান লেখক হলেও জনপ্রিয় নন। বাংলাদেশে তাঁর রচনা খুব একটা পড়া হয় না। একটি উপন্যাস ও কিছু ছোটগল্প বাংলায় অনূদিত হয়েছে মাত্র।

সিঙ্গার ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী এক লেখক। সাধারণ পাঠকের লেখক ছিলেন না। তিনি লেখকদের লেখক। নিজের জীবন নিয়ে বেশ কয়েকটা বই লিখেছেন। এক আত্মজৈবনিক রচনায় তিনি বলেছেন, 'আমি আগে থেকেই জানি, যা কিছু আমি লিখতে চাই—হয় তা ইতোমধ্যে আপনাদের জানা অথবা আপনাদের লাইব্রেরির শেলফে যে বইপত্র আছে সেখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে। এ কারণে ভদ্রতা ভুলে নিজের সম্পর্কে লিখতে মনস্থ করেছি; এ বিষয়টির ওপর অন্তত আমার সুনিশ্চিত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য রয়েছে। বিশ্বাস আছে, আমার জীবনীতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবেন।'

১৯৩৫ সালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন সিঙ্গার। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনি *লস্ট ইন আমেরিকা* নামে ১৯৮১ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান পরিবর্তনের যাত্রা ছিল না। তরুণ লেখক যেন অন্ধকার যুগ ছেড়ে বিশ শতকের আলোকিত জগতে প্রবেশ করেছিলেন। সে যাত্রা সুখকর ছিল না। ফলে তাঁর এই স্মৃতিকথাও সুখকর ঘটনার বিবরণ হয়ে ওঠেনি। তিক্ত সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সিঙ্গার নিউ ইয়র্ক

মহানগরীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তারপর চিরকালের জন্য থিতু হয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে—আর কোনোদিন জন্মভূমি পোল্যান্ডে ফিরে যাননি।

দুই

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সিঙ্গার চরিত্র চিত্রণে বাস্তবানুগ হওয়ার কারণে গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেন। যদিও তাঁর অনেক চরিত্রই ইহুদি অতীন্দ্রিয় চরিত্র। অতিপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে লিখলেও চরিত্র বর্ণনায় বরাবরই তিনি বাস্তববাদী। বাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়ে তিনি চরিত্রগুলোকে বাস্তব, চলিষ্ণু ও মানবিক করে তুলতেন। তাঁর লেখা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আজকের যুগে প্রায় বিলুপ্ত ইডিশ ভাষায় লিখলেও তাঁর রচনা পৃথিবীর সবগুলো প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যদিও ভাষান্তর করতে গিয়ে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনুবাদকদের। অনেকেই তাঁর লেখার অংশবিশেষ বাদ দিয়ে গেছেন।

সিঙ্গারের জন্ম ১৯০৪ সালের ২১ নভেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশ থেকে ২০ মাইল দূরে লিওনচিন গ্রামে। তাঁর ইহুদি নাম ছিল ইজাক জিনগার। আমেরিকায় যাওয়ার পর এই নাম বদলে ফেলেন। তাঁর একটা ছদ্মনামও ছিল—ভারসাভাসস্কি। সংবাদপত্রে লেখার সময় এ নামটি ব্যবহার করতেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম বাশেভিস, যেটি তিনি নিজের মায়ের নাম বাশেভা থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

একটি গোঁড়া ইহুদি পরিবারে কঠোর অনুশাসনের ভেতর মানুষ হয়েছেন সিঙ্গার। তাঁর বাবা ছিলেন একজন র‍্যাবাই, ইহুদি আইনজ্ঞ। শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। ইহুদি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার জন্য ছেলেকে উপদেশ দিতেন। মনেপ্রাণে চাইতেন পুত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করুক, একজন র‍্যাবাইয়ে পরিণত হোক।

সিঙ্গারের অনেক চরিত্র গোঁড়া ইহুদি হলেও তিনি নিজে তেমনটা ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ

করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ও অহংসম্পন্ন মানুষ; কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যেত না। তাঁকে বিষণ্ন প্রকৃতির বলে মনে হতো।

সিঙ্গাররা ছিলেন দুই ভাই এক বোন। বড় ভাই জশুয়া সিঙ্গার লেখক ছিলেন, বোন এস্তার ক্রেইটম্যান গল্প লিখতেন। সিঙ্গার খুব ছোটবেলা থেকে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে। প্রথম উপন্যাস *সেইটেন ইন গোরে* প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে।

জশুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলেন। পোল্যান্ডে তখন ইহুদিবিরোধিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ওখানে অবস্থান করা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় তিনি সিঙ্গারকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বসবাসের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিঙ্গার ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁকে এত উতলা করে তোলে যে, তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি নাকি যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চাননি। অথচ ওই সময়টা তাঁর জন্য ছিল একধরনের 'সুসময়।' তখন তিনশোরও বেশি গল্প লিখে ফেলেছেন। ধারণা করা হয়, ব্যক্তিগত দুর্ভোগ আর তখনকার প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁকে লেখার প্রেরণা জোগায়। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে যাতে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে ব্যাপারে ভাই জশুয়া তাঁকে প্রচণ্ড সহযোগিতা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি দৈনিক *ফরোয়ার্ড*-এ একটা চাকরিও জোগাড় করে দেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সিঙ্গার ওই পত্রিকায় কাজ করে গেছেন। সেসময় সিঙ্গার খুব একটা জনপ্রিয় ছিলেন না; কিন্তু ৬০ ও ৭০-এর দশকে *মাদমোয়াজেল, হারপার, দ্য স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট, ভোগ* ও *প্লেবয়* পত্রিকায় তাঁর সূক্ষ্ম ইরোটিক গল্পগুলো প্রকাশিত হলে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সিঙ্গারের জীবনযাপন সহজ ছিল না, কেননা নতুন একটি সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তাঁকে। যাঁকে বিয়ে করেছিলেন মিউনিখের সেই জার্মান নারী আলমা হেইম্যান বিলগোরাই সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। জীবনে কোনোদিন ওয়ারশতে

যাননি আর একবর্ণও ইডিশ জানতেন না। এসব সত্ত্বেও সিঙ্গারের বিবাহিত জীবন পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হয়। আমৃত্যু আলমা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পোল্যান্ডের শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে সিঙ্গার আর কখনোই পোল্যান্ডে ফিরে যেতে চাননি, শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে সিঙ্গার বলেছিলেন : 'আবেগের দিক থেকে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে হয়, নিজেকে কখনো বিদেশি বলে মনে হয় না আমার, কারণ আমি আমেরিকা ও তার মানুষকে ভালোবাসি; আর আমার নিজের দেশ পোল্যান্ড যেখানে আমার জন্ম, যতদূর জানি তার কোনো অস্তিত্বই নেই—সেখানে এক ভিন্ন পৃথিবী বিরাজমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এখন আমার সত্যিকার স্বদেশ। ইংরেজি আমার কাছে এখন দ্বিতীয় প্রকৃত ভাষা। আমেরিকা আমার আসল দেশ।'

আরেক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 'নিজেকে আমি একজন ইহুদি লেখক হিসেবে বিবেচনা করি, একজন ইডিশভাষী লেখক এবং একজন আমেরিকান লেখক। তবে পোল্যান্ড নিয়েও বিস্তর লেখালেখি করেছি।'

যুক্তরাষ্ট্রে এসে সিঙ্গার অনুধাবন করেন ইডিশ একটি মৃতপ্রায় ভাষা। বিশেষ করে আমেরিকাতে। তিনি তখন কেবল নিজের সংস্কৃতি থেকে সরে আসেননি, তাঁর স্বদেশ পোল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে হুমকির মুখে। সেই সময় তিনি প্রচণ্ড হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন আর ভাবেন আমেরিকায় আসাটা মস্ত ভুল হয়েছে। ইহুদি সংস্কৃতি ও নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, তিনি এমন একটা দেশে এসে বন্দি হয়েছেন যার সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। ভাইয়ের সঙ্গেও তাঁর সমস্যা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাই সিঙ্গারকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তিনি সিঙ্গারকে অনেক লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সিঙ্গারও শেষাবধি এমন কিছু লেখকের সান্নিধ্য পান—যাঁদের সঙ্গে ইহুদিবাদ, ইহুদি ও রুশ লেখক আর অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ লাভ করেন। ইংরেজিতে লেখার ব্যাপারটি যে গুরুত্বপূর্ণ—সিঙ্গার তখন অনুধাবন করেন। ইংরেজি না জেনে আমেরিকার মতো

দেশে টিকে থাকা কঠিন। তিনি ভাবলেন, আমেরিকায় থাকতে হলে পোল্যান্ডের ভাবনা ত্যাগ করতে হবে, নিজেকে খাঁটি আমেরিকানে পরিণত করতে হবে।

১৯৪৩ সালে সিঙ্গার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর ভাই জশুয়া মারা যান। ভাইয়ের মৃত্যুতে ভীষণ মুষড়ে পড়েন সিঙ্গার। ছয় বছর বলতে গেলে কিছুই লিখতে পারেননি। তিনি সবসময় বলতেন, তিনি যা কিছু লিখেছেন তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছেন। তাঁর জীবনে জশুয়া ছিলেন স্বীকৃত নায়ক, গুরু আর সাহিত্যের রোল মডেল। সবকিছুতেই ভাইকে অনুসরণ করতেন সিঙ্গার। অনেকের মতে, জশুয়া সিঙ্গারের চেয়ে ভালো লেখক ছিলেন এবং জশুয়ারই নোবেল পাওয়া উচিত ছিল।

সিঙ্গার শুধু নোবেল পুরস্কারই পাননি, পেয়েছেন দ্য ন্যাশনাল বুক প্রাইজ—একবার নয়, দুবার, ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালে। নোবেল তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। মিডিয়ার নজরেও আসেন। পত্রপত্রিকাগুলো তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, তাঁকে নিয়ে লেখালেখির ধুম পড়ে যায়।

জীবনের অধিকাংশ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটালেও সিঙ্গার ইডিশেই সাহিত্যচর্চা করে গেছেন, ইংরেজিতে লেখেননি কখনো। তবে ১৯৫০ সালের দিকে নিজের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদের বিষয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তিনি তাঁর লেখার ইংরেজি অনুবাদ পড়ার পর মাঝে মাঝে মূল ইডিশ লেখা পরিবর্তন করতেন। প্রথম জীবনে তিনি নিজেও অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন। জার্মান, হিব্রু ও ইডিশ থেকে অনুবাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর করা এরিখ মারিয়া রেমার্কের *অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* ও টমাস মান-এর *ম্যাজিক মাউন্টেন*-এর ইডিশ অনুবাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে, সিঙ্গার ছিলেন বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সাধারণ রচনা বা গল্প কাহিনি ফাঁদেননি। ইহুদি লোককাহিনি আর মোটিভগুলো তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রসাদগুণ। অসাধারণ তাঁর লেখাগুলো—যেখানে বিধৃত হয়েছে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, ইহুদিবাদ, ইহুদি ঐতিহ্য, পুরাণ, আচার-

অনুষ্ঠান, রীতিনীতি আর নানান সামাজিক সম্পর্ক। একদিকে রাজনৈতিক চিন্তার রক্ষণশীলতা আর অন্যদিকে অনুভূতির প্রাবল্য ও তীব্রতার দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব তাঁকে অনন্য এক বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত করেছে। প্রায়-বিলুপ্ত একটি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেও লেখার সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, অভূতপূর্ব মানবিকতা, মানব চরিত্রের গভীরতম প্রদেশে গিয়ে তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাকে অনন্য করে তুলেছে।

বিলগোরাইতে বসবাসের অভিজ্ঞতা ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর নানা রচনায়। ১৯১৭ সালে তিনি ও তাঁর মা পোল্যান্ডের ওই শহরে এসে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে বেশ কয়েকটা বছর ওখানে ছিলেন তাঁরা। তাঁর মা চাইতেন ওই দুঃসময়ে পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকুক। ওই বাড়িতে চাচা-চাচি আর ভাই-বোন পরিবেষ্টিত থাকলেও নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন সিঙ্গার। একাকিত্বের হাত থেকে বাঁচতে ইহুদি সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু পেতেন পাঠ করতেন। তিনি ইহুদিবাদ, ইডিশ বইপত্র, সংবাদপত্র, জার্নাল ইত্যাদি খুব মন দিয়ে পড়তেন আর জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যদের হিব্রু পড়াতেন। বিলগোরাইয়ে বসবাস করাটা তরুণ সিঙ্গারের জন্য সহজ ছিল না, তারপরও ওখানকার গ্রামীণ আবহ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। চার বছর বয়স থেকে ওয়ারশতে বসবাস করলেও বেড়ে ওঠার সময়গুলোতে তিনি ইহুদি ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বিলগোরাইয়ে থেকেছেন; আর প্রত্যক্ষ করেছেন ঐতিহ্য ও কুসংস্কারসমেত গোঁড়া ইহুদি-জীবন। র‍্যাবাই পিতার ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছেন। পড়াশোনা করেছেন র‍্যাবাইনিক্যাল সেমিনারিতে। এসব তাঁর লেখক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বিলগোরাইয়ের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে তাঁর ছোটগল্পগুলোকে প্রভাবিত করেছে, যেখানে ইহুদি শেকড়, পুরাণ, ঐতিহ্য, কুসংস্কার আর ইহুদি রাজনীতির প্রকাশ আছে।

সেসময় বিলগোরাইয়ের কড়া ইহুদি অনুশাসন থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন সিঙ্গার। অনুধাবন করেছিলেন, যে পথে এগোচ্ছেন সে পথ সঠিক নয়। তখন বাধ্য হয়েই সেমিনারির পড়াশোনা ছেড়ে দেন। হতাশা আসে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রান্তসীমায় এসে ভাবেন, তিনি কি লেখক হবেন? লেখক হওয়ার

ইচ্ছা তাঁকে প্রবলভাবে তাড়া করে। তিনি ওয়ারশর ইডিশ রাইটার্স ক্লাবে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। ওই ক্লাব তাঁর কাছে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। তিনি উপলব্ধি করেন, একমাত্র লেখার মাধ্যমেই নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। ক্লাবে প্রবেশের মাধ্যমে নিজের গৃহের সন্ধানই যেন লাভ করেন সিঙ্গার। ওখানে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যাদের সঙ্গে নিজের ইডিশপ্রীতি ও ভালোবাসার বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন।

তিন

সিঙ্গার মূলত ছিলেন গল্পকথক। তাঁর গল্পে এসেছে ঐতিহ্যবাহী ইহুদি গ্রাম ও শহর, তার অধিবাসীদের রীতিনীতি, জীবনযাপন পদ্ধতি আর পুরাণের জন্তু জানোয়ার। এসেছে অপদেবতা কিংবা দৈত্যদানব। ইহুদি কুসংস্কার অনুযায়ী মধ্যপৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। যেখানে দেবদূত আর ভূতপ্রেতের আনাগোনা। ইহুদি লোককাহিনিতে আছে দৈত্যদানবরা মানুষ বানাতে পারে, যারা জাদুশক্তির বলে পরিচালিত হয়। তাঁর কলম ছিল জাদুর রক্তবাহী শিরা—বাস্তব ও কল্পনা উভয় জগতে সম্মোহনের তীব্রতায় এমন এক জাদু সৃষ্টি করত যা পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

কিন্তু সিঙ্গার কোথায় পেলেন লেখার অনুপ্রেরণা? অনেক লেখকই সিঙ্গারকে প্রাণিত করেছেন। যাঁদের মধ্যে আছেন আন্তন চেখভ, তলস্তয়, গোগোল। তিনি মুগ্ধ হতেন দস্তয়েভস্কির লেখা পড়ে। বাস্তবতা ও ফ্যান্টাসি, শুভ ও অশুভ, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে রুশ লেখকগণ যে ভারসাম্য তৈরি করতেন তা পছন্দ করতেন সিঙ্গার। দস্তয়েভস্কির লেখায় মানুষের মুক্তচিন্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত; আর সিঙ্গারের নায়ক-নায়িকারা পরিচালিত হতো বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা। দুই লেখকের মধ্যে মিল ছিল এই যে, প্রচণ্ড বোধশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে কাহিনি রচনা করতেন দুজনেই—আর সবসময় পাঠকের কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত রাখতেন।

প্রচণ্ড দক্ষতার কারণে সিঙ্গার পছন্দ করতেন ফ্ল্যুবের কিংবা টমাস মানকে। জীবনের গল্পের সত্যিকার বয়ানকারী মনে না করলেও সিঙ্গার এঁদের রচনা ইডিশে অনুবাদ করেছিলেন। ফ্ল্যুবের ও সিঙ্গার উভয়েই তাঁদের রচনায় ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা সবসময় নিয়ম ভঙ্গকারী ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ পালনে ব্যর্থ মানুষের কথা লিখতেন। সিঙ্গারের লেখার প্রধান বিষয় ছিল সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের মানুষ ও তাদের জীবনের দুঃখকষ্ট, ধর্মীয় বিধিনিষেধ আর আইনকানুন ইত্যাদি। সারা জীবন তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন : একটি হচ্ছে সাহিত্য, অন্যটি প্রেম। কিন্তু তিনি প্রায়শই বলতেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সেক্সের মতোই পরাক্রমশালী একটি বিষয়।

মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পোর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি এখনো তাঁকে জিনিয়াস হিসেবে বিবেচনা করি। মহৎ লেখকদের অন্যতম প্রধান তিনি। তাঁকে আমি ইডিশে পড়েছি, পোলিশে পড়েছি, হিব্রুতে পড়েছি, জার্মানে পড়েছি, পড়েছি ইংরেজিতে। তাঁর সম্পর্কে এটাই বলব যে, তাঁকে যে ভাষাতেই পড়ি না কেন, তিনি একজন বড় লেখক।'

তিনি আভরন রেইজেন, স্ট্রিনবার্গ, গেন কাপলানো-তিটশ, তুর্গেনেভ, তলস্তয়, মোপাসাঁ ও চেখভের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন। তাঁর ওপর এই লেখকদের প্রভাবও আছে। তিনি অনেক দার্শনিকের রচনা পাঠ করেছেন এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে স্পিনোজা ও শোপেনহাওয়ার উল্লেখযোগ্য।

সিঙ্গার সবসময় বলতেন, একজন লেখকের তা-ই লেখা উচিত যা তিনি ভালোভাবে অবহিত। তাঁর গল্পের বিন্যাস দেখে এ কথা অনুধাবন করা যায়। লেখার পটভূমি পোল্যান্ড, কারণ তাঁর জন্ম সেখানে। ওই দেশটাকে তিনি ভালো করে জানতেন, আর ওখানকার সবকিছু ভালোমতো মনে আছে তাঁর। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি ও তাঁর পরিবার ক্রোচমালনা স্ট্রিটে উঠে আসেন, যা ছিল তাঁর লেখার প্রধান প্রেরণা। অধিকাংশ গল্পের ঘটনা ওখানেই ঘটে। ক্রোচমালনা স্ট্রিটকে

সিঙ্গার 'গল্পের খনি' বলে অভিহিত করেন। এরকম আর একটা জায়গা ছিল ফ্রামপোল। ২৫ বছর পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিকায় গল্প লেখা শুরু করেন, ততদিনে যুক্তরাষ্ট্র ও সেখানকার ইহুদিদের ভালোভাবে জেনে গেছেন।

সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না সিঙ্গার। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা ছিল তাঁর অ-ইহুদিমূলক মনোভাব এবং ইহুদিদের সম্পর্কে ভুল বর্ণনা পেশ। তাঁর বিরোধীরা দাবি করতেন, সিঙ্গারের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিরা এত বিকৃত রুচির ছিলেন না, তাঁরা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এতটা যাননি, যেরকমটা তাঁদের সিঙ্গার বর্ণনা করেছেন। সিঙ্গার তাদেরকে চোর, বেশ্যা ও প্রতারক বলে অভিহিত করেছেন। গোঁড়া ইহুদিরা এতে বিপন্ন ও দুর্বল বোধ করেছেন। তাদের মতে এসব নিছক গল্পকাহিনি ও মিথ্যাচার।

ইডিশ ভাষা ব্যবহারেও তাঁর সমালোচনা আছে। ইডিশ ব্যবহার না করে ইংরেজি বা অন্যকোনো ভাষা ব্যবহার করলে তিনি আরো পাঠক পেতেন। সিঙ্গার ওই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি ওই ভাষাটাই ভালোভাবে জানতেন আর তাঁকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিব্রুও জানতেন। তাঁর প্রথম কবিতা হিব্রুতে প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু সে ভাষা ছিল ধর্মীয় কাজের জন্য। তিনি যেহেতু প্রতিদিনকার জীবন বিধৃত করতে চেয়েছেন; তাই তাঁর জন্য হিব্রু উপযোগী ভাষা ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই বছর অবস্থানের পর সিঙ্গার আলমাকে বিয়ে করেছিলেন। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে তাঁদের কোনো সন্তান হয়নি। প্রথম বিয়ের সূত্রে আলমার এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। তারা তাদের বাবার সঙ্গে থাকত। সিঙ্গারের একজন অবৈধ পুত্রসন্তান ছিল, নাম ছিল ইসরায়েল জামির, তাঁর কমিউনিস্ট মিসট্রেস রুনিয়া শাপিরার সন্তান। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রুনিয়া সিঙ্গারের সাথে ছিলেন। 'রুনিয়াকে আমি বিয়ে করিনি, তা সত্ত্বেও সে ছিল আমার স্ত্রী। আমরা সে সময় খুবই প্রগতিশীল ছিলাম।'—নিজেই লিখে গেছেন সিঙ্গার। ১৯৩৫ সালে রুনিয়া ছেলেকে নিয়ে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তারপর তুরস্ক ও শেষে প্যালেস্টাইন

চলে যান। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ সিঙ্গারের চরম অপছন্দের বিষয় হলেও ভালোবেসে কমিউনিস্টকে প্রেমিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পিছপা হননি। তাঁর অনেক লেখাতেই কমিউনিস্ট নারী প্রধান চরিত্র হিসেবে এসেছে। সাধারণভাবে কমিউনিজমের প্রতি ঘৃণা থাকলেও নিজ দয়িতার মানবিক গুণাবলির প্রশংসায় কুণ্ঠিত ছিলেন না সিঙ্গার। তাঁর অন্যতম প্রধান উপন্যাস *শোশার* ডোরা চরিত্রের অনুপ্রেরণাও হতে পারে এটা। ডোরা ওই উপন্যাসের অরিলি চরিত্রটির কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উদ্ভাসিত নায়িকা।

১৯৫৫ সালে আমেরিকাতে পুত্র ইসরায়েল জামিরের সাথে সিঙ্গারের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এর আগে চিঠিপত্রের মাধ্যমে দুজনের যোগাযোগ হয়। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন সিঙ্গার। ইসরায়েল জামির ১৯৯৫ সালে *আ জার্নি টু মাই ফাদার, আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার* নামে একটি বই লিখেছিলেন। ওই বইয়ের ভূমিকায় জামির উল্লেখ করেন, '১৯৭৮ সালে বাবা নোবেল পান। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্টকহোমে যেতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান যাতে চমকপ্রদ ওই অনুষ্ঠানের মুহূর্তগুলো তাঁর সাথে ভাগ করে নিতে পারি।

'মনে আছে, ১৯৮০'র দশকে আমি নিউ ইয়র্ক সফরে গেলে বাবা তাঁর গল্প সংকলন *আ ফ্রেন্ড অব কাফকা* থেকে কিছু অংশ আমাকে পড়ে শোনান। ওখানে *দ্য সন* নামে এক গল্পে প্রধান চরিত্র ছেলেকে বিশ বছর না দেখার বেদনা নিয়ে নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে অপেক্ষায় বসে আছে, আর ভাবছে—পুত্র আসলে কী? অন্যদের চেয়ে কেন আমার ছেলে আমার এত ঘনিষ্ঠ? রক্তমাংসের এই ঘনিষ্ঠতার কী দাম আছে? আমরা কি সবাই সাধারণ জৈবিক ক্রিয়াকলাপের ফেনা নই?'

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সিঙ্গার। ১৯৯১ সালের ১৪ জুলাই সিঙ্গার মায়ামিতে মারা যান। তাঁর সম্মানে সার্ফ সাইড ও নিউ ইয়র্কের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

ম্যানহাটনে নিজ বাসগৃহে
আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার

প্র থ ম অ ধ্যা য়

এক

১৯৩০-এর দশকের প্রারম্ভে নিজের বিষয়ে আমার মোহভঙ্গের বিষয়টা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, কোনো আশাই আর অবশিষ্ট ছিল না। সত্যি বলতে, সামান্যই হারানোর ছিল আমার। জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতা দখলের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। পোল্যান্ডের ফ্যাসিস্টরা ঘোষণা করেছিল, নাৎসিরা ইহুদিদের যে হাল করেছে এখানেও তাদের অবস্থা তেমনটা করার পরিকল্পনা আছে। গিনা মারা যাওয়ার পরই আমি বুঝেছিলাম ভালোবাসার ধন, নিষ্ঠা, ঈশ্বরে বিশ্বাস আর মানবিক মূল্যবোধ আমি হারিয়ে ফেলেছি। স্তেফা মি. লেও ত্রেতলার নামে এক ধনী ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিল। আমার ভাই জশুয়া, স্ত্রী গেনিয়া আর ছেলেকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি *দ্য জিউয়িশ ডেইলি ফরোয়ার্ড*-এ কাজ নিয়েছিলেন। তাঁদের চৌদ্দ বছর বয়সি ছেলে ইয়াশা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। ছেলেটির মৃত্যু আমাকে গভীর বিষণ্নতার ভেতর নিয়ে গিয়েছিল যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। মৃত্যুর সঙ্গে ওটাই ছিল আমার প্রথম প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ।

সেই সময়ের আশেপাশের কোনো তারিখে আমার বাবাও মারা গিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জীবনের ওই পরম ক্ষতির বিষয়ে এখনো বিস্তারিত বলতে পারব না আমি। শুধু এইটুকু বলতে পারি—বাবা একজন সাধুর মতো জীবনযাপন করেছিলেন, মৃত্যুও হয়েছে একজন সাধুর মতো। ঈশ্বরে

কোনো মানুষই সরল জীবনের পথে হাঁটতে পারে না। তাকে অতিক্রম করতে হয় কর্দমাক্ত পথ, লুকোচুরি করে এগিয়ে যেতে হয়, আর এর ভেতর দিয়েই নিজেকে পাচার করে দিতে হয়। আমি আমার হিসাব মানুষের সঙ্গে করিনি, করেছি ঐশ্বরিক কিংবা নারকীয় কোনো শক্তির সঙ্গে।

সাবিনার জীবন থেকে আমি সরে গেছি। সে স্ট্যালিনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ট্রটস্কিপন্থিতে পরিণত হয়েছে। তার ভাই মোতেল ডাকও একই কাজ করেছে। ভাইবোন দুজনেই আশা করে, মানবজাতি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে সত্যিকার ত্রাণকর্তা স্ট্যালিন নন, ট্রটস্কি। পোল্যান্ডের সামাজিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবেন আইজ্যাক ডইচার, একগুঁয়ে আর পাষাণ হৃদয়ের স্ট্যালিনবাদী আইজ্যাক গর্ডিন নন (ইনি এগারো বছর স্ট্যালিনের বন্দিশিবিরে আটক ছিলেন)।

আমি যেহেতু আত্মহননের সাহসটুকু সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি, আমার বাঁচার একটিমাত্র পথ—পোল্যান্ড থেকে পালিয়ে যাওয়া। সামনে কী নারকীয় সময় আসছে তা বোঝার জন্য কাউকে বিশেষভাবে দূরদর্শী হওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা ছেলেমানুষিতে পূর্ণ স্লোগানে সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়েছে তারা বুঝতে পারছে না আমাদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। এমনসব জননেতা আর নির্বোধের অভাব নেই যারা ইহুদি জনমানুষের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে—পোলিশ বিধর্মী আর পৌত্তলিকদের পাশে থেকে লড়াই করবে। ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটলে পোল্যান্ডের ইহুদি ও বিধর্মীরা সারা জীবনের জন্য একে অপরের ভাইয়ে পরিণত হবে। ধর্মভীরু ইহুদি নেতারা তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইহুদিরা যদি যথাযথভাবে *তৌরাত* পাঠ করে আর তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় বিদ্যায়তন ও ইহুদি সেমিনারি ইয়েশিভাতে পাঠায়, পরম করুণাময় তাদের পক্ষ হয়ে অলৌকিক কিছু একটা ঘটাবেন।

আমি সবসময়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলাম। তবে ইহুদিদের ইতিহাস বিষয়ে এমন জ্ঞানগম্যি আমার আছে যে, আমি ওই

অলৌকিক ব্যাপারটার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারি। শেমিয়েলনিত্স্কির সময় থেকেই ইহুদিরা *তৌরাত* পাঠ করে আসছে; আর সব প্রজন্মের আগে-পরে ইহুদিবাদে আস্থা স্থাপন করেছে। তখন জ্ঞানালোকের উন্মেষ ঘটেনি কিংবা প্রচলিত ধর্মমতের বাইরে যেত না কেউ। অত্যাচার আর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছিল তারা সবাই ছিল ধর্মপ্রাণ ইহুদি। ওই সময়ের ওপর আমি একখানা বই লিখেছিলাম, যার নাম ছিল *সেইটেন ইন গোরে*। তখনো সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়নি—*গ্লোবাস* সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিল। সেখান থেকে একটি টাকাও আমি পাইনি। উপরন্তু ছাপার খরচ আমাকে বহন করতে হয়েছিল।

আমার মতো সন্দেহে যে ভোগে স্বভাবতই সে নিঃসঙ্গ। ইডিশ লেখকদের মধ্যে মাত্র দুজন আমার বন্ধু ছিলেন : আরন জিতলিন এবং জে. জে. ট্রাঙ্ক।

আরন জিতলিন আমার চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের বড় ছিলেন। আমি তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের একজন বড় কবি বলে গণ্য করতাম। ইডিশ ও হিব্রু ভাষাতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে ইডিশ লেখাগুলোতে তাঁর বিপুল সৃষ্টিশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে। বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আধ্যাত্মিক বামনদের মধ্যে ছিলেন আধ্যাত্মিক দানবসদৃশ মানব। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ওয়ারশর ইডিশ পেন ক্লাব আমার বই *সেইটেন ইন গোরে* প্রকাশ করলে জিতলিন তার ভূমিকা লিখেছিলেন। আমেরিকা গিয়ে পৌঁছাবার আগে মুদ্রিত বইখানা আমার হাতে আসেনি।

আমরা দুজনেই ছিলাম নিঃসঙ্গ মানুষ। দুজনেই জানতাম একটা ধ্বংসের তাণ্ডব আসন্ন। আমি প্রায়ই তাঁর সিয়েনা স্ট্রিটের বাসায় যেতাম। এমনকি দুজনে মিলে উন্মাদ দার্শনিক অটো ওয়েনিঙ্গারের ওপর বই লেখার চেষ্টা করেছিলাম। তিনিও মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসতেন। তিনি তখন *দি এক্সপ্রেস* পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। মাঝেমধ্যে ওই পত্রিকায় আমার ছোট ছোট গল্প ছাপা হতো।